চিন্তন

স্বামীজীর ‘হিন্দুধর্ম’ বক্তৃতা

পূর্বা সেনগুপ্ত

শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের নবম দিবসে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বিখ্যাত ‘হিন্দুধর্ম’ বক্তৃতাটি করেছিলেন। বক্তৃতাটির প্রথমেই তিনি হিন্দুধর্মের প্রেক্ষাপটরূপে বিশ্বের তিনটি ধর্ম ও তাদের ইতিহাসের উল্লেখ করেছেন : হিন্দু, ইহুদি ও পারসিক। ইহুদি ধর্মের উৎপত্তি ইব্রাহিমের পুত্র ইয়াকুব বা জেকবের থেকে, আর ইহুদি ধর্ম থেকেই খ্রিস্ট ও ইসলামের উৎপত্তি। পারসিক ধর্মের উদ্গাতা জরথুস্ট্র। ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তি একেশ্বরবাদ। ঈশ্বর এক। অপর দিকে জরথুস্ট্র বা পারসিকগণ বলেন জগতে মূল দুটি শক্তি বর্তমান। একটি শুভ, অন্যটি অশুভ। সর্বক্ষণ শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব চলছে। জীবের কর্তব্য অশুভের বিনাশ করে শুভকে প্রতিষ্ঠা করা।

হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক ক্ষেত্রটি সমুদ্রের মতো, যেমন বিস্তৃত, তেমনি গভীরতায় অতলস্পর্শী। শুধুমাত্র একেশ্বরবাদ বা শুভ- অশুভের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এই ধর্মকে নির্দিষ্ট করা যাবে না। এই ধর্মের তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে সমস্ত ধর্মের সব বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। বহু নদীর মতো ধর্মের বহমান স্রোতোধারা একত্রে মিশ্রিত হয়েছে এই হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক সাগরে। একেশ্বরবাদ? হ্যাঁ, তারও অস্তিত্ব আছে, আছে নিরীশ্বরবাদের, এমনকী অজ্ঞেয়বাদও সংশ্লিষ্ট হয়েছে সম মর্যাদায়। তার সঙ্গে নাস্তিক ইহজাগতিক ভাবনাও সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। ঈশ্বরের রূপ নিয়েও মতভেদ কম নয়—কারও মতে তিনি নিরাকার, কারও মতে তিনি সাকার। হিন্দুধর্ম দুই ক্ষেত্রকেই সমান গুরুত্ব প্রদান করেছে। কেবল তাই-ই নয়, সামান্য প্রতীক আরাধনা থেকে পুরাণের কাহিনিগুলিও মর্যাদা লাভ করেছে স্ব স্ব স্থানে। কিন্তু এত বৈচিত্র্যকে সঙ্গে নিয়ে একটি ভাবনার স্রোতোধারা অগ্রসর হয়েছে কীভাবে? বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার—এ-জগৎ চৈতন্যময়, জড়ের কোনও অস্তিত্বই এখানে নেই— এই তত্ত্বও হিন্দুধর্মই ব্যক্ত করেছে। এত বৈচিত্র্য একাধারে ধারণ করে হিন্দুধর্ম কি পরস্পরবিরোধী দোষে দুষ্ট? যদি তা না হয় তবে এত বৈচিত্র্যের সাধারণ ভিত্তিভূমিটি কী?—এই প্রশ্ন দিয়েই স্বামীজী আলোচনার সূচনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

‘‘এই সকল বহুধা বিভিন্ন ভাব কোন্ সাধারণ কেন্দ্রে সংহত হইয়াছে? কোন্ সাধারণ ভিত্তি আশ্রয় করিয়া এই আপাতবিরোধী ভাবগুলি অবস্থান করিতেছে? আমি এখন এই প্রশ্নেরই মীমাংসা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।’’

বেদ

স্বামীজীর আলোচনা শুরু হয়েছিল হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যের বৃত্তটি কোন একত্বের খুঁটিতে বাঁধা আছে, এর নাভিকেন্দ্রটি কী—সেই বিষয়টিরই উত্তর প্রদানের মাধ্যমে। কোথা থেকে হিন্দুভাবনার সূচনা হল? স্বামীজী জানালেন, বেদ থেকে। ''আপ্তবাক্য বেদ হইতে হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম লাভ করিয়াছেন।'' বেদ অনাদি অনন্ত শুনে মানুষের মনে ব্যঙ্গাত্মক ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। কারণ একটি গ্রন্থ কি কখনও অনাদি বা অনন্ত হতে পারে? কিন্তু বেদ কোনও গ্রন্থ নয়, বেদ শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। কীসের জ্ঞান? এই জগৎ কী? এই জগতে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ চরম সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। সেই উপলব্ধিজাত জ্ঞান তাঁদের নিজস্ব নয়, এই উপলব্ধি কোথা থেকে যেন এসেছে। স্বামীজী বলছেন,

''ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বেদ সেই-সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডারস্বরূপ। আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং সমুদয় মনুষ্য-সমাজ ভুলিয়া গেলেও যেমন ঐগুলি বিদ্যমান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীও সেইরূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত সকলের পিতাস্বরূপ পরমাত্মার যে দিব্য সম্বন্ধ, আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিস্মৃত হইয়া গেলেও এগুলি থাকিবে।''

জগতে যে-সত্যগুলি বিদ্যমান তাদেরই পুনরাবিষ্কার করেন ঋষিগণ। তাই ঋষি প্রণম্য। আমরা ঋষিদের বংশধররূপে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি। ঋষিদের এই আবিষ্কার সব ধর্মের মধ্যেই আছে। ইয়াকুব স্বপ্নে দেখেছেন, স্বর্গীয় সিঁড়ি বেয়ে দেবদূত তাঁর কাছে নেমে এসে সত্যের আভাস দিয়ে গেলেন। হজরত মহম্মদও এক পাহাড়ের উপর হঠাৎ সত্যের সন্ধান লাভ করেছেন। সত্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের কাছে আর সেই সত্যই তাঁরা প্রচার করেছেন, তাই প্রতিটি ধর্মে একজন ধর্মপ্রচারকের দেখা পাই। কিন্তু হিন্দুধর্মের সৃষ্টিকর্তার কোনও বিশেষ নাম আমরা পাই না। কারণ ঋষিগণ—যাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন তাঁরা নিজেদের নাম বা পরিচয়কে প্রাধান্য দেননি। শুধু অনুভূত সত্যকে 'বেদ' বা 'শ্রুতি'তে প্রকাশিত করেছিলেন। এখানেই অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্মের প্রধান পার্থক্য। কারণ হিন্দুধর্ম মনে করে সত্য সুপ্ত থাকে, তাকে সাধনা দিয়ে প্রকাশিত করতে হয়। এখানে ব্যক্তি নয়, সুপ্ত শক্তির বিকশিত ধারাই গুরুত্ব লাভ করে। ব্যক্তি অনিত্য আর সত্য চিরন্তন—তার আদিও নেই, অন্তও নেই। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজী জানিয়েছিলেন ঋষিদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন। অর্থাৎ সত্য উপলব্ধিতে ভারতে নারীদের ভূমিকাকেও স্বীকার করা হয়েছে।

হিন্দুধর্ম বক্তৃতার প্রথমে স্বামীজী দেখিয়েছেন হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি 'বেদ' ও 'ঋষি'গণ হলেন তার উদ্‌গাতা। বেদ অর্থাৎ জ্ঞান। স্রষ্টা ও সৃষ্ট জীবের প্রকৃত রহস্য যে-জ্ঞানের মধ্যে বিধৃত রয়েছে সেই জ্ঞান। বেদ ও ঋষি হিন্দুধর্মের ভিত্তিরূপে চিহ্নিত। ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব—এই চার বেদের মধ্যে যাবতীয় জ্ঞানরাশি অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জ্ঞান অনন্ত হতে পারে বটে কিন্তু তার আদি বা সূচনাকাল নেই—এ কী করে হয়? একটি সূচনা সর্ববিষয়েই বর্তমান। বেদোক্ত জ্ঞানের সূচনা নেই কেন? অনাদি কেন? কেনই বা অনন্ত? এই প্রশ্ন নিয়ে স্বামীজী বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছেন। বেদ বলেন সৃষ্টি অনাদি অনন্ত। এই সূত্র ধরে স্বামীজী তাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সূচনা করেছেন।

এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে শক্তির মাধ্যমে। বিজ্ঞান বলে কতগুলি শক্তি আমাদের সমস্ত কিছু গঠনের জন্য দায়ী। কিন্তু তার সঙ্গে একথাও বিজ্ঞান বলে, এই শক্তির যে-সমষ্টি তা চিরকাল সমপরিমাণ। জীব ও বস্তুর ভঙ্গুর, বিনাশশীল চরিত্র শক্তির ক্ষেত্রে কোনও তারতম্যের সৃষ্টি করে না। কিন্তু এমন এক সময় নিশ্চয়ই ছিল যখন কিছুই ছিল না, সেই সময় শক্তি কোথায় ছিল? যদি বলা যায় ঈশ্বরের মধ্যেই এই শক্তি নিহিত ছিল তবে তর্কের দিক দিয়ে এই ব্যাখ্যা দাঁড়ায় না। কেন? স্বামীজীর যুক্তির মাধ্যমে বিষয়টি ব্যক্ত করলে ধারণাটি আমাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ধরা দেবে : ''বেদ বলেন—সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, বিশ্বশক্তির সমষ্টি সর্বদা সমপরিমাণ।... যখন কিছুই ছিল না, তবে এই সকল ব্যক্ত শক্তি তখন ছিল কোথায়?... এগুলি অব্যক্ত অবস্থায় ঈশ্বরেই ছিল। তাহা হইলে বলিতে হয়—ঈশ্বর কখনও সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয়, কখনও সক্রিয় বা গতিশীল; অর্থাৎ তিনি বিকারশীল! বিকারশীল পদার্থমাত্রই মিশ্র পদার্থ এবং মিশ্র পদার্থমাত্রই ধ্বংস-নামক পরিবর্তনের অধীন। তাহা হইলে ঈশ্বরেরও মৃত্যু হইবে; কিন্তু তাহা অসম্ভব। সুতরাং এমন সময় কখনও ছিল না, যখন সৃষ্টি ছিল না; কাজেই সৃষ্টি অনাদি।" 'অন্তর্নিহিত' নয়, একই মহাশক্তি কখনও প্রচ্ছন্ন কখনও প্রকাশিত। সাংখ্যমতে ঈশ্বর সেই মহাশক্তি বা প্রকৃতির একটি প্রকাশমাত্র। অন্তর্নিহিত শব্দটির পরিবর্তে 'সুপ্ত' বা 'প্রচ্ছন্ন শক্তি বা ক্ষমতা', অথবা 'নিহিত কার্যক্ষমতা' শব্দটির প্রয়োগের কথাই স্বামীজী বলেছেন।

সূক্ষ্ম ও স্থূল : বিবর্তন (Concept of Evolution and Involution)

এক্ষেত্রে আমাদের ক্রমবিবর্তন ও ক্রমসংকোচনের ধারণাটি বুঝতে হবে। কারণ স্বামীজী তাঁর হিন্দুধর্ম বক্তৃতার মধ্যে দুটি বিষয় চিহ্নিত করছেন : প্রথমত জড় ও চৈতন্য সমান্তরালভাবে চলছে, দ্বিতীয়ত সৃষ্টি ও স্রষ্টা সমান্তরালভাবে বহমান। আপাতদৃষ্টিতে এই দুই সিদ্ধান্তবাক্য বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করে বলেই মনে হয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টি যদি সমান্তরাল তরঙ্গে বহমান হয় তবে এই দুয়ের মধ্যে চিরকালীন প্রভেদ থেকেই যায়, যেখানে অদ্বৈত তত্ত্ব অসম্ভব বলে মনে হয়। আর জড় ও চৈতন্য এই দুটিও যদি সমান্তরালভাবে অবস্থান করে—তবে 'সবই চৈতন্যময়'—এই বাক্যটির সার্থকতা কোথায়?

স্বামীজীর এই বক্তব্যের অর্থ বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে সমান্তরাল শব্দটির অর্থ কী। স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন হিন্দু দর্শনের বিবর্তনবাদের ধারণাকে এই আলোচনায় প্রয়োগ করেছেন। বিশ্বের বিবর্তনবাদীদের মধ্যে অধিকাংশ পণ্ডিত সরলরেখায় উন্নতি বা বিবর্তনের তত্ত্বকে স্বীকার করে থাকেন। যেমন সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস সমাজের অগ্রগতির পথরেখাকে সরলরেখার আঙ্গিকে (Linear conception of Historical and Social change) তুলে ধরেছেন। এরই সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী ভিলফ্রেড প্যারেটো (1848-1923) এবং পিটিরিম এ সরোকিন (1889-1968) তাঁর 'Social and Cultural Dynamics' গ্রন্থে সমাজ পরিবর্তনের গতিকে ঢেউয়ের গতির মতো বলে ব্যাখ্যা করেছেন (Cyclical conception of historical and social change)। এঁরা বলে থাকেন সমাজের অগ্রগতি যেন ঠিক ইংরেজি অক্ষর S-এর মতো। সূচনাবিন্দু থেকে ধীরে ধীরে উঠতে থাকে আবার ধীরে ধীরে তার গতি নিম্নমুখী হয়ে যায়। আবার তা ঊর্ধ্বে চলতে শুরু করে।

হিন্দু দর্শনও বলে থাকে এই জগতের সমস্ত কিছুই ঢেউয়ের গতিতে অগ্রসরমান। একবার উন্নতির শিখরে, পরবর্তী ধাপে গতি নিশ্চিত

নিম্নমুখী। ঠিক সেইরকমই এই জগতের সমস্ত বস্তু সূক্ষ্ম থেকে স্থূল আবার স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে ধাবমান। বটবৃক্ষের একবিন্দু বীজের মধ্যেই নিহিত আছে বিরাট মহীরূহের সম্ভাবনা, একটি অ্যামিবার মধ্যেও প্রসুপ্ত রয়েছে বুদ্ধত্বের সমস্ত আভাস। শব্দ সূক্ষ্ম কিন্তু সেই শব্দ থেকেই সৃষ্ট স্থূল জগৎ। অর্থাৎ কেবল ক্রমসংকোচন (involution) নয়, এর সঙ্গে জড়িত থাকে ক্রমবিবর্তনের (evolution) ধারণা। অর্থাৎ স্রষ্টা যদি অনন্তকাল থেকে বর্তমান থাকে তবে সৃষ্টিও অনন্তকালের, চৈতন্য যদি অনন্তের আভাস হয় তবে জড়ও তার চিরসঙ্গী।

স্বামীজী বলছেন, ''ঈশ্বর শক্তিস্বরূপ—নিত্যসক্রিয় বিধাতা; তাঁহারই নির্দেশে বিশৃঙ্খল প্রলয়াবস্থা হইতে একটির পর একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ জগৎ সৃষ্ট হইতেছে, কিছুকাল চালিত হইতেছে, পুনরায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। হিন্দুবালক গুরুর সহিত প্রতিদিন আবৃত্তি করিয়া থাকে : 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।'—অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব-পূর্ব কল্পের সূর্য ও চন্দ্রের মতো এই সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত।'' অর্থাৎ বিধাতা সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেন আবার তা ধ্বংস করেন, আবার সেই একই প্রলয়সাগর থেকে সৃষ্ট হয় সূর্য ও চন্দ্র। এইভাবে অনাদি অনন্তকাল থেকেই সৃষ্টি ও স্রষ্টার গতি সমান্তরালভাবে চলছে অর্থাৎ একবার ক্রমবিকশিত হচ্ছে আবার ক্রমসংকুচিত হচ্ছে। বর্তমানে বিজ্ঞান সৃষ্টি সম্বন্ধে একই কথা ব্যক্ত করছে।

হিন্দুধর্ম বক্তৃতায় স্বামীজী প্রথম পর্যায়ে বেদ, ঋষি এবং তার সঙ্গে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্বন্ধ বর্ণনা করেছেন। হিন্দুরূপে আমাদের পরিচয় বেদের প্রতি আস্থা ও ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধা। এ হল হিন্দুধর্মের মূল দুই ভিত্তি। সৃষ্টি ও স্রষ্টার পারস্পরিক সম্পর্ক এভাবে কোনও ধর্মে ব্যাখ্যা করা হয়নি যা বৈজ্ঞানিক ধারণার মাধ্যমে স্বীকৃত হয়েছে। এরপরে তিনি হিন্দুধর্মের আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়টিতে প্রবেশ করেছেন। এই আলোচনায় তিনি দেখাবেন জড় ও চৈতন্য কীভাবে সমান্তরাল গতিতে বহমান। এখানে প্রথমেই বলে রাখা দরকার সমান্তরাল মানে দুটি পৃথক সরলরেখা নয়, একটির সঙ্গে অপরটির সমভাবে সম্পৃক্ততার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে আলোচনা একটু বিস্তৃত করা যেতে পারে।

স্থান কলকাতার বাগবাজার। ১৮৯৭-এর মার্চ মাসের কোনও একদিন। স্বামীজী তখন বলরাম ভবনে বাস করছেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী দশদিন ধরে স্বামীজীর কাছে বেদের সায়নভাষ্য পাঠ করছেন। শিষ্য জানাচ্ছেন, সায়নাচার্যের 'বেদকে অবলম্বন করেই সৃষ্টির বিকাশ হয়েছে'—এই মত স্বামীজী অনুমোদন করলেন। প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধার করছি।

স্বামীজী—'বেদ' মানে অনাদি সত্যের সমষ্টি; বেদপারগ ঋষিগণ ঐ সকল সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন, অতীন্দ্রিয়দর্শী ভিন্ন, আমাদের মতন সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সে-সকল প্রত্যক্ষ হয় না; তাই বেদে ঋষি শব্দের অর্থ মন্ত্রার্থদ্রষ্টা; পৈতা-গলায় ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণাদি জাতিবিভাগ পরে হয়েছিল। বেদ শব্দাত্মক অর্থাৎ ভাবাত্মক বা অনন্ত ভাবরাশির সমষ্টিমাত্র। 'শব্দ' পদের বৈদিক প্রাচীন অর্থ হচ্ছে সূক্ষ্মভাব, যা পরে স্থূলাকার গ্রহণ করে আপনাকে প্রকাশিত করে। সুতরাং যখন প্রলয় হয়, তখন ভাবী সৃষ্টির সূক্ষ্ম বীজসমূহ বেদেই সম্পুটিত থাকে। তাই পুরাণে প্রথমে মীনাবতারে বেদের উদ্ধার দৃষ্ট হয়। প্রথমাবতারেই বেদের উদ্ধারসাধন হল। তারপর সেই বেদ থেকে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হতে লাগল; অর্থাৎ বেদ-নিহিত শব্দাবলম্বনে বিশ্বের সকল স্থূল পদার্থ একে একে তৈরি হতে লাগল। কারণ, সকল স্থূল পদার্থেরই সূক্ষ্ম রূপ হচ্ছে শব্দ বা ভাব। পূর্ব পূর্ব কল্পেও এইরূপে সৃষ্টি হয়েছিল। একথা বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্রেই আছে

'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ পৃথিবীং দিবঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।' বুঝলি?

শিষ্য—কিন্তু মহাশয়, কোন জিনিস না থাকিলে কাহার উদ্দেশে শব্দ প্রযুক্ত হইবে? আর পদার্থের নামসকলই বা কি করিয়া তৈয়ারি হইবে?

স্বামীজী—আপাততঃ তাই মনে হয় বটে। কিন্তু বোঝ; এই ঘটটা ভেঙে গেলে ঘটত্বের নাশ হয় কি? না। কেননা, ঘটটা হচ্ছে স্থূল; কিন্তু ঘটত্বটা হচ্ছে ঘটের সূক্ষ্ম বা শব্দাবস্থা। ঐরূপে সকল পদার্থের শব্দাবস্থাটি হচ্ছে ঐ সকল জিনিসের সূক্ষ্ম াবস্থা। আর আমরা দেখি শুনি ধরি ছুঁই যে জিনিসগুলো, সেগুলো হচ্ছে ঐরূপ সূক্ষ্ম বা শব্দাবস্থায় অবস্থিত পদার্থসকলের স্থূল বিকাশ। যেমন, কার্য আর তার কারণ। জগৎ ধ্বংস হয়ে গেলেও জগদ্বোধাত্মক শব্দ বা স্থূল পদার্থসকলের সূক্ষ্ম স্বরূপসমূহ ব্রহ্মে কারণরূপে থাকে। জগদ্বিকাশের প্রাক্কালে প্রথমেই সূক্ষ্ম স্বরূপসমূহের সমষ্টিভূত ঐ পদার্থ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে ও উহারই প্রকৃত স্বরূপ শব্দগর্ভাত্মক অনাদি নাদ 'ওঁ'কার আপনা আপনি উঠতে থাকে। ক্রমে ঐ সমষ্টি হতে এক একটি বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রথমে সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি বা শাব্দিক রূপ ও পরে স্থূল রূপে প্রকাশ পায়। ঐ শব্দই ব্রহ্ম—শব্দই বেদ। ইহাই সায়নের অভিপ্রায়। বুঝলি?

শিষ্য—মহাশয়, ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামীজী—জগতে যত ঘট আছে, সবগুলো নষ্ট হলেও ঘট শব্দ থাকতে যে পারে, তা তো বুঝেছিস? তবে জগৎ ধ্বংস হলেও বা যে-সব জিনিসগুলোকে নিয়ে জগৎ, সেগুলো সব ভেঙে-চুরে গেলেও তত্তদ্বোধাত্মক শব্দগুলি কেন না থাকতে পারবে? আর তা থেকে পুনঃসৃষ্টি কেনই বা না হতে পারবে?

শিষ্য—কিন্তু মহাশয়, 'ঘট ঘট' বলিয়া চিৎকার করিলেই তো ঘট তৈয়ারি হয় না?

স্বামীজী—তুই আমি ঐরূপে চিৎকার করলে হয় না, কিন্তু সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঘটস্মৃতি হবামাত্র ঘট প্রকাশ হয়। সামান্য সাধকের ইচ্ছাতেই যখন নানা অঘটন-ঘটন হতে পারে—তখন সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মের কা কথা। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম প্রথম শব্দাত্মক হন, পরে 'ওঁ'কারাত্মক বা নাদাত্মক হয়ে যান। তারপর পূর্ব পূর্ব কল্পের নানা বিশেষ বিশেষ শব্দ, যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, বা, গো, মানব, ঘট, পট ইত্যাদি ঐ 'ওঁ'কার থেকে বেরুতে থাকে। সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্ম ঐ ঐ শব্দ ক্রমে এক একটা করে হবামাত্র ঐ ঐ জিনিসগুলো অমনি তখনি বেরিয়ে ক্রমে বিচিত্র জগতের বিকাশ হয়ে পড়ে। এইবার বুঝলি—শব্দ কিরূপে সৃষ্টির মূল?

শিষ্য—হাঁ, একপ্রকার বুঝিলাম বটে, কিন্তু ঠিক ঠিক ধারণা হইতেছে না।

স্বামীজী—ধারণা হওয়া—প্রত্যক্ষ অনুভব করাটা কি সোজা রে বাপ? মন যখন ব্রহ্মাবগাহী হতে থাকে, তখন একটার পর একটা করে এইসব অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষে নির্বিকল্পে উপস্থিত হয়। সমাধিমুখে প্রথম বুঝা যায়—জগৎটা শব্দময়, তারপর গভীর 'ওঁ'কার ধ্বনিতে সব মিলিয়ে যায়।—তারপর তা-ও শুনা যায় না।—তা-ও আছে কি নাই এইরূপ বোধ হয়। ঐটেই হচ্ছে অনাদি নাদ, তারপর প্রত্যক-ব্রহ্মে মন মিলিয়ে যায়। ব্যস্—সব চুপ।

স্বামীজীর কথায় শিষ্যের পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল, স্বামীজী ঐ সকল অবস্থার ভিতর দিয়া অনেকবার স্বয়ং সমাধি-ভূমিতে গমনাগমন করিয়াছেন, নতুবা এমন বিশদভাবে এ-সকল কথা কিরূপে বুঝাইয়া বলিতেছেন? শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে ও ভাবিতে লাগিল—নিজের দেখা-শুনা জিনিস না হইলে কখনো কেহ এরূপে বলিতে বা বুঝাইতে পারে না।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন, ''অবতারকল্প

মহাপুরুষেরা সমাধিভঙ্গের পর আবার যখন 'আমি আমার' রাজত্বে নেমে আসেন, তখন প্রথমেই অব্যক্ত নাদের অনুভব করেন; ক্রমে নাদ সুস্পষ্ট হয়ে 'ওঁ'কার অনুভব করেন, 'ওঁ'কার থেকে পরে শব্দময় জগতের প্রতীতি করেন, তারপর সর্বশেষে স্থূল ভূত-জগতের প্রত্যক্ষ করেন। সামান্য সাধকেরা কিন্তু অনেক কষ্টে কোনরূপ নাদের পারে গিয়ে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারলে পুনরায় স্থূল জগতের প্রত্যক্ষ হয় যে নিম্নভূমিতে—সেখানে আর নামতে পারে না। ব্রহ্মেই মিলিয়ে যায়—ক্ষীরে নীরবৎ।"

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ থেকে দীর্ঘ অংশ উদ্ধার ব্যতীত বেদ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিন্দুধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বের স্বামীজীকৃত ব্যাখ্যা ভাল করে ব্যক্ত করা যায় না। তিনি বলছেন, হিন্দুধর্ম অনুযায়ী কোনও কিছুরই ধ্বংস হয় না, শুধু সূক্ষ্মাকারে শক্তি সংকুচিত ও ধীরে ধীরে তা-ই বৃহদাকারে প্রকাশিত হতে থাকে। যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তাঁরা ঘট শব্দটির উচ্চারণের মাধ্যমে তা সৃষ্টিও করতে পারতেন। অগ্নি আমাদের চারপাশে অবস্থিত কিন্তু তাকে প্রজ্বলিত করতে হয়। এই প্রজ্বলনের পদ্ধতি মানুষ উদ্ভাবন করেছে। প্রথমে কাঠের ঘর্ষণে বা পাথরের ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হত, এখন আধুনিক উপায়। অর্থাৎ যা সূক্ষ্মরূপে পরিব্যাপ্ত তাকে বাস্তবরূপ সহ প্রকাশ করা সম্ভব। এখানে ওঁকারের শক্তি কতখানি তা বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম প্রথমে শব্দাত্মক হন ও পরে ওঁকারাত্মক বা নাদাত্মক হয়ে যান—স্বামীজীর এই বর্ণনা নিশ্চিত সৃষ্টিতত্ত্বের এক বিরল সহজতম ব্যাখ্যা। আমরা তাঁর একান্ত অনুগত গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দের লেখায় এই 'ওঁকার'-এর গুরুত্বের কথা পাই। ১৯৩৫-এর ২০ এপ্রিল তিনি বিনোদেশ্বর দাশগুপ্তের দুই কন্যা গৌরী ও শিবানীকে লিখছেন,

''তোমাদিগকে একটা কথা লিখিয়া সাবধান করিতেছি। পত্রের উপর শ্রীশ্রীদুর্গা, শ্রীশ্রীগুরুদেব সহায় বা শ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ না লিখিয়া 'প্রণব' মন্ত্র লিখিতে যাও কেন? ঐ মন্ত্রের তুল্য মহা গুহ্যতম মন্ত্র আমাদের আর নাই। উহা কি যেখানে সেখানে লিখিতে হয়?... শ্রীঠাকুরের কাছে কোন গৃহস্থ ভক্ত ঐ মন্ত্র চেঁচাইয়া কয়েকবার বলায় তিনি তাহাকে খুব ধমকাইয়া দিয়াছিলেন।''

ঠিক একই ভাবের কথা তিনি স্বয়ং বিনোদেশ্বর বাবুকেও লিখছেন ১৯৩৫-এর ৬ জুলাই তারিখে : ''চিঠির মাথায় ওঁ আর লিখো না। আরও কত ঠাকুর দেবতার নাম আছে, তাই লিখবে। এত বড় 'মন্ত্র' নিয়া অমন নাড়াচাড়া করতে নেই।''

আমরা আজও প্রণবমন্ত্রের যথাযথ মূল্য দিতে জানি না। আজ যখন তখন মোবাইলের রিং টোনে বেজে ওঠে প্রণব সংযুক্ত গায়ত্রী মন্ত্র। যে-কোনও অবস্থায় এ আমরা উচ্চারণ করছি, শুনছি। এর যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয় সে-সম্বন্ধে সচেতন নই। এ হল গুরুমুখী বিদ্যা। ভিন্ন পত্রে অমরেন্দ্র ব্যানার্জিকে সারগাছি থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখছেন : ''গায়ত্রীর সাধারণ অর্থ যে-কোন সন্ধ্যাবিধি হইতে এখন পড়িয়া মোটামুটিভাবে বুঝিয়া লও। পত্রে উহা লিখিয়া জানানো সম্ভব নয়। কারণ, গায়ত্রী-মন্ত্রের অর্থ অতি গভীর ভাবপূর্ণ; এবং উহার অর্থও বহু ঋষি বহু প্রকারে করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন উপাসক হিসাবে বিভিন্ন অর্থ বলিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং যখন তুমি সামনে উপস্থিত থাকিবে, তখনই বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিব।''

স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দের সমসাময়িক বাংলায় শাক্ত ধারার প্রচলন অধিক। বৈদিক ধারা বাংলায় তখন সবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের যুবকভক্তবৃন্দ পদব্রজে ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং বৈদিক ধারার রূপ কী হবে, আধুনিক যুগে তার অবস্থান কী হবে, কী

অবস্থায় এখন তার উপস্থিতি সে-সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানও অর্জন করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ শেষদিন পর্যন্ত বৈদিক শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন। এর ফলে মানুষের মন থেকে কুসংস্কার দূর হবে—এই ছিল তাঁর মত। স্বামী অখণ্ডানন্দও ছিলেন সেই একই পথের পথিক। পরিব্রাজক অবস্থায় খেতড়িতে তিনি একটি বেদ বিদ্যালয়ের দেখা পান। কিন্তু সেখানেও সীমাবদ্ধতা ছিল। শুধুমাত্র পাঠ দিলেই হবে না, তার অর্থও বুঝতে হবে। যুগোপযোগীভাবে যাতে তার প্রয়োগ হয় সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে।

আমরা হিন্দুধর্ম বক্তৃতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে দেখব স্বামীজী জড় ও চৈতন্য প্রসঙ্গেও সেই একই বাক্য উচ্চারণ করছেন।

প্রতিটি ধর্মভাবনার সৃষ্টি হয়েছে একটি প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে—আমি কে আর ভগবানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কী। কথামৃতে দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, দুই শ্রেণির ভক্ত আছেন, এক শ্রেণির ভক্ত বলেন, ''হে প্রভু আমায় রক্ষা করো।'' আর দ্বিতীয় শ্রেণির ভক্ত বলেন, ''আমি কিছু চাই না, কেবল জানতে চাই আমি কে আর আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?'' স্রষ্টার মাধ্যমে সৃষ্টি যে অনন্তের সঙ্গে অনুস্যূত হয়ে রয়েছে তা সহজেই বোধগম্য হয়। কী করে? স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন, ''যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমার সত্তাসম্বন্ধে চিন্তা করিবার চেষ্টা করি—'আমি' 'আমি' 'আমি', তাহা হইলে আমার মনে কি ভাবের উদয় হয়? এই দেহই আমি—এই ভাবই মনে আসে। তবে কি আমি জড়ের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নই? বেদ বলিতেছেন : না, আমি দেহমধ্যস্থ আত্মা—আমি দেহ নই। দেহ মরিবে কিন্তু আমি মরিব না।'' অর্থাৎ স্বামীজী—'আমি কে?'—এই প্রশ্ন ধরে উপনীত হলেন আর এক বিষয়ে। সেই বিষয়টি হল 'আত্মা'। আমি স্বরূপত চৈতন্য কারণ আমার দেহ নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী, এক সময় এই দেহ বিনষ্ট হবেই। কিন্তু দেহ বিনষ্ট হলেও আমি থাকব। কারণ আমি স্বরূপত জড় নই—আমি চৈতন্য, আত্মা। স্রষ্টার আত্মস্বরূপ।

হিন্দুধর্ম আত্মার কথা বলে। এই আত্মা কোনও সৃষ্ট পদার্থ নন। সৃষ্ট মানেই তার বিনাশ আছে। কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। আমি আমার বর্তমান দেহটি গ্রহণ করার আগেও আত্মা ছিল আবার দেহ বিনষ্ট হলেও আত্মা থাকবে। আত্মা আর একটি দেহ ধারণ করে নবজন্ম লাভ করবে। সুতরাং এই জন্মই সব নয়, আমরা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এক জন্ম থেকে আর-এক জন্ম নিই, বহু জন্মের মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে চলি। মন ও আত্মা যে এক নয় তা স্বামীজী যুক্তির মাধ্যমে আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন, ''দেখা যাইতেছে যে, দুইটি সত্তা সমান্তরাল রেখায় বর্তমান—একটি মন, অপরটি স্থূল পদার্থ। যদি জড় ও জড়ের বিকার দ্বারাই আমাদের অন্তর্নিহিত সকল ভাব যথেষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়, তবে আর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। কিন্তু জড় হইতে চিন্তা উদ্ভূত হইয়াছে—ইহা প্রমাণ করা যায় না, এবং যদি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে একত্ববাদ অপরিহার্য হয়, তবে আধ্যাত্মিক একত্ববাদ নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত এবং জড়বাদী একত্ববাদ অপেক্ষা ইহা কম বাঞ্ছনীয় নয়...।''

এখানে স্বামীজী তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন : Philosophical Monism (দার্শনিক একত্ব), Spiritual Monism (আধ্যাত্মিক একত্ব) এবং Materialistic Monism (জড়বাদী একত্ব)। স্বামীজী দেখিয়েছেন 'আধ্যাত্মিক একত্ব' (Spiritual Monism)-কেই হিন্দুধর্ম এই জগৎ সৃষ্টির মূল কারণরূপে চিহ্নিত করেছে। এই আধ্যাত্মিক একত্বই 'আত্মা'র অস্তিত্ব প্রমাণ করে। জড়বাদী বা দার্শনিক একত্ব স্বীকার করলে অবিনাশী আত্মার ধারণা

যুক্তিগ্রাহ্য হয় না। জড় বিনষ্ট হয়ে যায়, চৈতন্য অবিনাশী। চৈতন্য থেকেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি, চৈতন্যই মূল—এই তত্ত্বই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। তাই হিন্দু সেই চৈতন্যস্বরূপ 'আধ্যাত্মিক একত্ব'কেই প্রাধান্য দিয়েছে।

তাহলে হিন্দুধর্মের স্তম্ভরূপে যে-কয়েকটি মূল ধারণা পাওয়া গেল সেগুলি হল :

১. এই ধর্ম প্রাচীন ও গতিশীল।

২. এই ধর্মের মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা জগতের অন্যান্য ধর্মকে নিজ অঙ্গে অঙ্গীভূত করতে সক্ষম।

৩. স্রষ্টা অবিনাশী, সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর সমান্তরাল সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক সমান্তরাল।

৪. দেহ জড়, আত্মা চৈতন্যস্বরূপ।

৫. আত্মা এক দেহ থেকে আর-এক দেহকে আশ্রয় করে পরমাত্মার দিকে এগিয়ে চলে।

জমান্তরবাদ ও কর্মবাদ

আত্মার অস্তিত্ব ও তার এক দেহ থেকে অপর দেহে গমনের ফলে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হয়েছে। জন্মান্তরবাদ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে কর্মবাদ। সুকর্ম সুন্দরজীবন উপহার দেয়, কুকর্ম কদর্য জীবনের কারণ হয়। জীবনের সুখ ও দুঃখের এই মূল রহস্য। স্বামীজী কোন যুক্তির উপস্থাপনের মাধ্যমে জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেটি স্বামীজীর ভাষাতেই জেনে নেব : ''কেহ জন্মিয়া অবধি সুখভোগ করিতেছে... আবার কেহ জন্মিয়া অবধি দুঃখভোগ করিতেছে...। যখন সকলেই এক ন্যায়পরায়ণ ও করুণাময় ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট, তখন কেহ সুখী এবং কেহ দুঃখী হইল কেন? ভগবান কেন এত পক্ষপাতী? যদি বলো যে, যাহারা এ জন্মে দুঃখভোগ করিতেছে, পরজন্মে তাহারা সুখী হইবে, তাহাতে অবস্থার কিছু উন্নতি হইল না। দয়াময় ও ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের রাজ্যে একজনও কেন দুঃখভোগ করিবে?... অতএব স্বীকার করিতে হইবে সুখী বা দুঃখী হইয়া জন্মিবার পূর্বে নিশ্চয় বহুবিধ কারণ ছিল, যাহার ফলে জন্মের পর মানুষ সুখী বা দুঃখী হয়; তাহার নিজের পূর্বজন্মের কর্মসমূহই সেই-সব কারণ।"

এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে স্বামীজী হিন্দুধর্মের কর্মবাদকে স্বীকার করলেন। পূর্বার্জিত কর্ম আমাদের বর্তমান সুখ বা দুঃখের কারণ। স্বামীজী তাই বললেন, ''মানুষের আত্মা অনাদি অমর পূর্ণ ও অনন্ত এবং কেন্দ্র-পরিবর্তন বা দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু। বর্তমান অবস্থা পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম দ্বারা, এবং ভবিষ্যৎ বর্তমান কর্ম দ্বারা নিরূপিত হয়। আত্মা জন্ম হইতে জন্মের পথে—মৃত্যু হইতে মৃত্যুর দিকে কখন বিকশিত হইয়া, কখন সঙ্কুচিত হইয়া অগ্রসর হইতেছেন।" এই কথা বলেই স্বামীজী প্রশ্ন করছেন, ''প্রচণ্ড বায়ুমুখে ক্ষুদ্র তরণী যেমন একবার ফেনময় তরঙ্গের শীর্ষে উঠিতেছে, পরক্ষণেই মুখব্যাদানকারী তরঙ্গ-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মাও কি সদসৎ কর্মের একান্ত বশবর্তী হইয়া ক্রমাগত একবার উঠিতেছে ও একবার পড়িতেছে?... আত্মা কি একটি ক্ষুদ্র কীটের মতো কার্যকারণ চক্রের নিম্নে স্থাপিত? আর ঐ চক্র সম্মুখে যাহা পাইতেছে, তাহাই চূর্ণ করিয়া ক্রমাগত বিঘূর্ণিত হইতেছে—বিধবার অশ্রুর দিকে চাহিতেছে না, পিতামাতৃহীন বালকের ক্রন্দনও শুনিতেছে না?

''ইহা ভাবিলে মন দমিয়া যায়, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মই এই। তবে কি কোনও আশা নাই? পরিত্রাণের কি কোন পথ নাই? মানবের হতাশ হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এইরূপ ক্রন্দনধ্বনি উঠিতে লাগিল, করুণাময়ের সিংহাসন সমীপে উহা উপনীত হইল, সেখান হইতে আশা ও সান্ত্বনার বাণী নামিয়া আসিয়া এক বৈদিক ঋষির হৃদয় উদ্বুদ্ধ করিল। বিশ্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ঋষি তারস্বরে

জগতে এই আনন্দ সমাচার ঘোষণা করিলেন, 'শোন শোন হে অমৃতের পুত্রগণ...'।"

শিকাগো সম্মেলনে স্বামীজীর মুখে এ ছিল এক ঐতিহাসিক উচ্চারণ। তাঁর প্রথম দিনের বক্তৃতায় 'হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' সম্বোধনে শ্রোতার দল উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'অমৃতের পুত্র'রূপে তাঁর সম্বোধন। যদি প্রথম সম্বোধনে তিনি সমগ্র বিশ্বকে একাত্মভাবে আলিঙ্গন করে থাকেন তবে দ্বিতীয় সম্বোধন তাঁদের কাছে সেই একাত্মভাব প্রসূত, আপনভাবজনিত অসামান্য গভীর তাত্ত্বিক উপহার, তাঁর 'আধ্যাত্মিক একত্ব' (Spiritual Monism) দর্শন থেকেই এ-সম্বোধন উৎসারিত হয়েছিল। এ ছিল পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের সাধনতত্ত্বের উন্মোচন। ভারতীয় হিন্দুধর্মের গভীরতার আভাস।

এই সম্বোধনের দ্বারা স্বামীজী সেমেটিক ধর্মের একেবারে বিরুদ্ধ বক্তব্য প্রদান করলেন। এটি ছিল এক অভাবনীয় ব্যাপার। সেমেটিক ধর্ম বলে মানুষ পাপের সন্তান। পাপ থেকেই তার সৃষ্টি। কিন্তু ঠিক এর বিপরীত কথাই হিন্দুধর্ম বলে থাকে—আমরা অমৃতের পুত্র। অমৃতের সন্তান। অমৃতত্বই আমাদের স্বভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ ভেড়ার পালে বাঘ পড়ার গল্প বলতেন। বাঘ সন্তান প্রসব করে মারা যেতে ব্যাঘ্রশাবক ভেড়ার পালের মধ্যেই বড় হতে লাগল। ভেড়াদের মতোই ঘাস খেতে শিখল। এইভাবে সে যখন বড় হয়ে উঠেছে তখন আবার একদিন সেই ভেড়ার পালে আর একটি বাঘের আগমন হল, সেই নতুন বাঘটি শিশু বাঘকে ভেড়াদের সঙ্গে চরতে দেখে একেবারে অবাক। সে সেই শিশু বাঘকে জলের ধারে নিয়ে গিয়ে দেখাল—এই দেখ তুই যেমন আমিও তেমনই। আমরা স্বভাবত বাঘ, কিন্তু নিজেকে ভেড়া বলে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বাস করছি। শ্রীরামকৃষ্ণ এই উপমা প্রয়োগ করে বলছেন, এই বাঘের মতোই গুরু আমাদের স্বরূপ উন্মোচিত করেন। সেই স্বরূপ হল—আমরা অমৃতের সন্তান। স্বামীজী বিশ্বধর্মসম্মেলনে কেবল হিন্দুধর্মকে উন্মোচিত করেননি। তিনি প্রতিটি ধর্মের অবস্থানকে নির্দিষ্ট করেছিলেন। তিনি যখন সেমেটিক ধর্মাবলম্বীদের অর্থাৎ খ্রিস্টানদের সম্মুখেই—মানুষ স্বরূপত অমৃতের পুত্র—এই আশ্বাসবাণী ঘোষণা করছিলেন তখন বহু মানুষের মন থেকে ধর্মীয় উদ্বেগ অপসৃত হয়ে এক শান্তির আশ্বাসে জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। পাপের নেতিবাচক নিগড় থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে তারা পেয়েছিল উদার উন্মুক্ত প্রেমময় সদর্থক এক জীবনদর্শন। সে-জীবনদর্শন পাপ থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য, নরক থেকে মুক্তিলাভের জন্য, কিংবা স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় পুণ্যলাভের কামনায় উন্মত্তের মতো ঘুরে মরে না। সে-জীবনদর্শন শান্তি, প্রাপ্তি, তৃপ্তি দিয়ে গড়া। শিকাগোর ১৯ তারিখের সভার শ্রোতৃবৃন্দ এই উদার আশাময় আদর্শকে লাভ করলেন। স্বামীজীর সেই আদর্শের মূল ভাবনাটি প্রদানের বাক্যটি ছিল অভিনব, ঐতিহাসিক। প্রাচীন ঋষিদের মুখে যে-বাণী উদ্‌ঘোষিত হয়েছিল সেই ঋষিমুখনিঃসৃত বাণীর মতোই তা উপস্থিত সমস্ত শ্রোতাদের জাগ্রত করেছিল নবতম চেতনায়। অধ্যাপক বিনয় সরকার বলেছেন, ''এ ছিল পাঁচটি শব্দের বোমা।"

স্বামীজী বলেছিলেন, '' 'অমৃতের পুত্র'—কি মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে চান না। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী—পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্য-ভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের উপর ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ। ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হইয়া

তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করিতেছ, ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়া দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির-আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও, জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।"

স্বামী বিবেকানন্দের এই বক্তব্য শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। ধর্মবিষয়ে অতৃপ্ত, নতুন কিছু পাওয়ার আশায় উদ্বুদ্ধ মানুষগুলি পেয়েছিল এমন এক তত্ত্ব যা তাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তাদেরও সেই দর্শনের অনুরাগী করে তুলেছিল। ধর্মগত ক্ষেত্রে যে-বিশ্বাস ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। নবচেতনায় আন্দোলিত হয়েছিল সমগ্র বিশ্ব। কেবল সেমেটিকরা কেন, স্বয়ং ভারতের জনগণও কি ভুলে যায়নি নিজেদের স্বরূপ, নিজেদের মহান তাত্ত্বিক ঐতিহ্য? এই ইতিবাচক দর্শনকে তারাও তো বিস্মৃত হয়েছিল একেবারে। স্বামীজী হিন্দুধর্মকে নতুনভাবে তুলে ধরলেন। যে-চিরস্মরণীয় আদর্শকে সামাজিক অস্থিরতায় মানুষ ভুলে গিয়েছিল তাকে পুনরায় প্রতিস্থাপিত করলেন। জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদকে ধরে আত্মার অমরত্ব ও দিব্যতাকে তুলে ধরলেন তিনি।

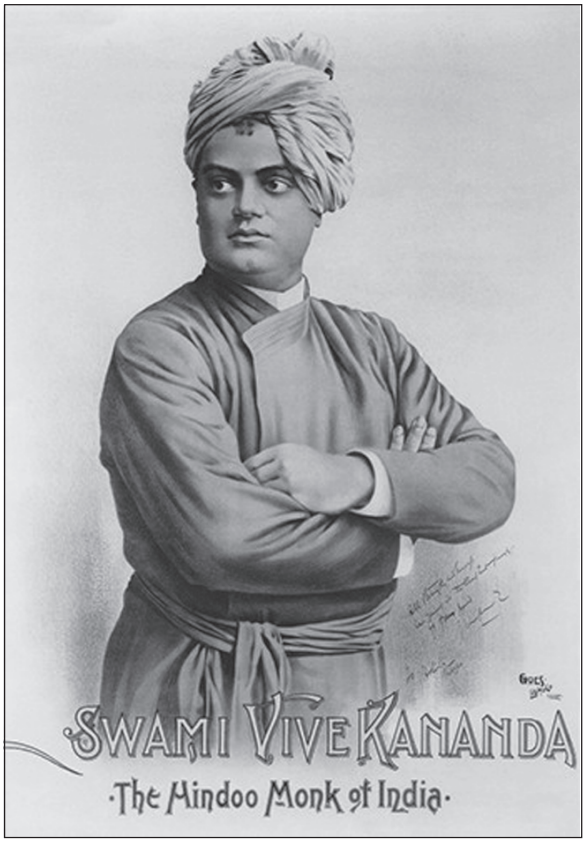

এর সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও স্বামীজী রাখলেন। সেটি হল, আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। তা-ই যদি হয়, যদি আত্মার বিনাশ না হয়, তবে সেই অবিনাশী শক্তি কেন জড়ের দাসত্ব করেন? কেন তিনি দেহধারণ করেন, কেন নিজেকে দেহ বলে মনে করেন? চৈতন্য কেন জড়ের অনুগত হন? এ-প্রসঙ্গে স্বামীজী হিন্দুধর্মের প্রদত্ত উত্তরটি দিয়েছেন—হিন্দুধর্ম বলে, কেমন করে পূর্ণ আত্মা নিজেকে অপূর্ণ ও জড়ের অধীন বলে মনে করেন তা আমরা জানি না। একে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মনে করার থেকেও স্পষ্টভাবে উত্তর দেওয়া হয় যে আমরা এর উত্তর জানি না। *ক্রমশ*

সহায়ক গ্রন্থ

১। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা), খণ্ড ১ (২০০১)
২। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১১)